নিজের কথা

জঁ-লুক গদার

'যাঁরা হাতে বন্দুক নিয়েছেন, তাঁদের পাশে আমার থাকা উচিত। কিন্তু বন্দুকের জন্য আমি ক্যামেরা ছেড়ে দিতে রাজি নই। আমি মনে করি শিল্প এক বিশেষ বন্দুক। সব আইডিয়াও বন্দুক। অনেক লোকই আইডিয়া থেকে এবং আইডিয়ার জন্যই মারা যাচ্ছেন। আমি মনে করি বন্দুক হল কার্যকর আইডিয়া এবং একটি আইডিয়া হল তাত্ত্বিক বন্দুক। চলচ্চিত্র এক তাত্ত্বিক বন্দুক এবং বন্দুক হল এক কার্যকর ছবি। সৌভাগ্যক্রমে আমার কোন বন্দুক নেই। সৌভাগ্য, কারণ আমার চোখ এত খারাপ যে হয়ত আমি আমার সব বন্ধুকেই হত্যা করে বসব। আমার মনে হয় ছবির ব্যাপারে আমার দৃষ্টি ততটা কম নয়, তাই ছবি করাটাই বাঞ্ছনীয় মনে করি।'

তবে আরও অনেকের থেকে ছবি করার কাজটা আমার কাছে কঠিনতর কেননা আমার কোন লিখিত চিত্রনাট্য থাকে না—কাজ চলতে চলতেই সব কিছু জন্ম নেয়। এজাতীয় অ-পূর্বনির্ধারিত পদ্ধতি তখনই কার্যকরী হয় যখন ভিতটা আগে থেকে বেশ পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে ভাবা থাকে। যার জন্য প্রয়োজন নিটোল মনোনিবেশ।

কেবল চিত্রগ্রহণকালেই যে আমি ছবি করি তা নয়, খাওয়া, পড়া, স্বপ্ন দেখা, এমনকি কথা বলার সময়েও ছবি তৈরি হতে থাকে। এই জন্যেই ছবি করা আমার কাছে একই সঙ্গে ক্লান্তিজনক ও আনন্দদায়ক।

ছবিতে গল্প : ওটা আমার ধাতে সয় না। গল্প বলার কায়দাটাই আমি জানি না। সমগ্র ব্যাপারটিকে আমি উন্মোচিত করতে চাই প্রত্যেকটা দৃষ্টিকোণ থেকে আবার একসঙ্গে সব বলে ফেলা আমার প্রবৃত্তি। নিজেকে এইভাবে ব্যাখ্যা করতে ভালো লাগে : আমি একজন পেইন্টার ইন লেটার্স, যেমন বলা হয় ম্যান অফ লেটার্স। ফলে গল্প নয়, আমার আসল লক্ষ্য হচ্ছে ছবিতে সেই বিরাট পরিবর্তন দেখানো, যার মধ্য দিয়ে আধুনিক সভ্যতা বিবর্তিত হচ্ছে; এবং সেই পরিবর্তনের সঙ্গে সার্থকভাবে মোকাবিলা করার পথ সন্ধান।

প্রথমেই বলা ভালো যে আজকের ফ্রান্সে বাস করতে পারার জন্য আমি বিশেষভাবে খুশি কারণ পরিবর্তনটা যে-যুগে অত্যন্ত প্রচণ্ড একজন শিল্পীর পক্ষে তখন এরকম পরিবেশ বেশ উত্তেজক। বর্তমানে ইউরোপে সবকিছু—প্রাদেশিক জীবন, যুব সম্প্রদায়, নাগরিক উন্নয়ন ব্যবস্থা, শিল্পায়ন—আন্দোলিত; তবে এসব প্রত্যক্ষ করার চোখ থাকা চাই। এই অসাধারণ যুগে সংবাদপত্রের মত কেবল নতুন গ্যাজেট বা শিল্পোন্নয়নের বর্ণনা করলেই আধুনিক জীবনকে তুলে ধরা যায় না—আসল পরিবর্তনটাকে পর্যবেক্ষণ করা দরকার। তাই পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গিটা খুব জরুরি।

যেমন দৃষ্টান্তস্বরূপ, কোন ছবির ক্ষেত্রে, আমি এই ছবিটাই কেন করছি, ঠিক এভাবেই বা কেন : অবিশ্রাম নিজেকে এইসব প্রশ্ন করতে থাকি। চিত্রগ্রহণরত আত্মপ্রতিকৃতি লক্ষ্য করি। ছবির কোন দৃশ্যে, যেমন একটি বাড়ির দৃশ্যে নিজেকে জিজ্ঞাসা করি : এই মুহূর্তে, অন্য কোন মুহূর্তে নয়, এই বাড়িটারই, অন্য কোন বাড়ি নয়, শট নেওয়া কি উচিত হচ্ছে? অর্থাৎ, এক কথায়, বিশেষ কিছু নির্বাচনের স্বেচ্ছাচারী প্রকৃতি এবং তাকে সমর্থন করার জন্য সাধারণ সূত্রাবিষ্কারের যে প্রচেষ্টা, দর্শককে তার অংশীদার হতে আমি বাধ্য করি। আপনারা আমার সরব মনন শুনতে পান। আমার অনেক ছবিই প্রকৃত প্রস্তাবে, ঠিক ফিল্ম নয়, ফিল্ম সম্বন্ধীয় নিবন্ধ। এই রূপেই তারা নির্মিত এবং আমার ব্যক্তিগত সমীক্ষার অঙ্গবিশেষ। কাহিনির চেয়ে ডকুমেন্টারি বলাই সঙ্গত।

কি, ভাবছেন নিজেকে খুব সিরিয়াসলি নিচ্ছি? তা আপনার অনুমান সত্য কেননা আমার কাছে পরিচালকের ভূমিকা এত বড় যে নিজেকে সিরিয়াসলি নিতেই হয়। ছবি করার সময় পরিচালক কেবলমাত্র একটা দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার প্রধানই নন, বিরাট কর্মীবৃন্দের দক্ষ নেতাও বটে। সুতরাং তাঁর সম্ভাবনাও অকল্পনীয়। ব্যাঙ্ক, ইউনিয়ন, সরকার—সমাজের সর্বস্তরের লোকের সঙ্গে তাঁর কারবার। তাঁকে আলাপ আলোচনা চালাতে হয়, কখনো নিয়ন্ত্রণ করতে হয়, কখনো বা প্রভাব বিস্তার, তিনি দেনাও করেন, বিনিয়োগও। বিষফোঁড়ার মত তাঁকে আবার দর্শকের প্রতিক্রিয়াও সহ্য করতে হয়। তাঁর কোনরকম ভুল ত্রুটি কেউ বরদাস্ত করে না। যতক্ষণ শুদ্ধ শিল্প ততক্ষণ তিনিই সব, কিন্তু প্রয়োগের সময় তিনিই আবার অনিশ্চিত রাষ্ট্রনায়ক।

এটা আমরা অনুভব করেছি যে বর্তমান ফ্রান্সের মত অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য আর কোন দেশে পাওয়া যাবে না। তাদের মধ্য থেকে বেছে নেওয়াটাই একটা কঠিন কাজ। খেলাধূলা, রাজনীতি, সব বিষয়েই আমার সমান অনুরাগ—এমনকি মুদির দোকান পর্যন্ত। যেমন এডওয়ার্ড লেকবার্ক, একজন অদ্ভুত লোক, তাঁর সম্পর্কে বা তাঁর সঙ্গেও আমি ছবি করতে চাই। ছবিতে সবই অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব, বস্তুত করা উচিত। যেমন, কিউবায়

নিরক্ষরদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার কিংবা উত্তর ভিয়েতনামের যুদ্ধক্ষেত্রে একটা নতুন স্বপ্নের জন্মদর্শন—এসব প্রসঙ্গও ছবির মধ্যে ঢোকাবার। যেমন একদিন ইচ্ছা ছিল, এডি কনষ্টান্টিনকে নিয়ে একটা ফিল্ম করব, তার মুখটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, মার্তিয়ানের মুখের মত। প্রথম দৃশ্যে দেখা যাবে একটা লোক একটা আণবিক মেঘ পেরিয়ে অন্য দিকে বেরিয়ে আসছে। এই লোক হল এডি কনষ্টান্টিন। তারপরে কী ঘটবে তখনো জানি না। ক্রমে এই থেকেই 'আলফাভিল' ছবিটি হয়েছিল।

আমার ছবিতে ভিয়েতনাম, জ্যাকুয়েন, কিংবা অবিশ্বাসিনী স্ত্রীর প্রসঙ্গ কেন আসে —এধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হলে প্রশ্নকর্তাকে যে-কোন দৈনিক খুলে দেখতে বলি। ঐ কাগজটাতেই সব পাওয়া যায়। সভ্যতার অঙ্গস্বরূপ তারা। এ কারণেই টেলিভিশন—আধুনিক জীবনের এক চমকপ্রদ প্রকাশ মাধ্যম—আমাকে এত আকর্ষণ করে। সযত্নে তৈরি করা নিখুঁত সংবাদপত্র বা টেলিভাইজড্ সংবাদ একটা অসাধারণ জিনিস। বিজ্ঞাপন আমার আর একটা অবসেশন। পৃথিবীতে এখন প্রচারযন্ত্রই চরম প্রভু, সর্বনিয়ামক ও সর্বভূক। অন্য কারোর যে স্বাধীনতা নেই তা বিজ্ঞাপনে আছে এবং এই অর্থেই আধুনিক সমাজের প্রতিনিধিত্ব করার দাবি তার এত বেশি যে তাকে তথ্যের যে-কোন সংগ্রহশালা অপেক্ষা বেশি মূল্যবান ভাণ্ডার বলা চলে। কেবলমাত্র বিজ্ঞাপনের জন্য আমি কয়েকটা খবরের কাগজ কিনি। বিজ্ঞাপনের প্রতিটি দিক—বর্ণনার ভঙ্গি, ভোগী জনসাধারণকে বশীকরণের মন্ত্র, চিত্রমালা—সব আমাকে গ্রাস করে। এর গুরুত্ব অসীম, অথচ তার স্বীকৃতি এত স্বল্প যে, যে-কোন দেয়ালে দেখা যায় এমন একটি পোস্টারের শট নেওয়ার অপরাধে আমাকে যৌনতা সম্পর্কে অতিরিক্ত স্পষ্টভাষণের অভিযোগে পড়তে হয়েছিল। আমি শুধু পোস্টারগুলোকে এক জায়গায় জড়ো করেছিলাম যার ফল, সমালোচকদের ধারণা, নাকি দুঃসাহসিক।

অবশ্য বিদেশিরা যাই ভাবুক না কেন যৌনতা ফ্রান্সে একটা ট্যাবু। যৌন সমস্যা নিয়ে স্পষ্ট ছবি করা একেবারে অসম্ভব না হলেও অত্যন্ত কঠিন। একটা কথা খোলাখুলি বলাই ভালো—স্পষ্ট ছবি করতে গেলে সংস্কারহীনতা প্রয়োজন এবং সত্যি কথা বলতে একমাত্র বুনুয়েল ছাড়া আর কেউ যৌনতা নিয়ে প্রকৃত ফিল্ম করতে পারেন নি। মনস্তাত্ত্বিকের মত যৌনতাকে উদাসীন বিশ্লেষণ করা ভয়ানক শক্ত। আর সংস্কারহীনতা, অন্তত আমার ক্ষেত্রে বেশ কষ্টসাধ্য। প্রোটেস্টান্ট চারিত্র্যলক্ষণ এখনো আমার মধ্যে আছে যদিও মুক্তির জন্য কোনদিনও সংগ্রাম-বিরত হইনি। কিন্তু যখনই কিছু করতে গেছি, ছবিতে প্রতিবারই তা নাকি দর্শককে ধাক্কা দিয়েছে। অবশ্য আমি বুঝতে পারি না কেন।

'Le Petit Soldat'-য়ে আমি দেখিয়েছিলাম একটা মানুষকে টর্চার করা হচ্ছে। আমি অনেক সময়ই ভেবেছি আমাকে টর্চার করা হলে আমি কোন স্বীকারোক্তি করব

কিনা, ও যদি না করিতো কেন। এই ছবিটা করার সময় আমি মালরো-র কথা বিশেষভাবে মনে রেখেছিলাম—একটা লোক যে তার নিজের কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছিল তাকে নিয়ে তিনি একটা গল্প লিখেছিলেন। আমার ছবির নায়কও সর্বদাই তার নিজের কণ্ঠস্বরকে চিনে উঠতে চাইছে। এমনকি সে যখন আয়নায় তার মুখ দেখছে, মনে হচ্ছে, সেটা তার নিজের মুখ নয়। সে এমন সব কাজ করে যাচ্ছে যা সে আসলে করতে চায় না। যেন সব কিছুই তার ভেস্তে যাচ্ছে, ক্রমেই সে জড়িয়ে পড়ছে জালের ভেতর। ছবির শেষে, সমস্ত তিক্ত অভিজ্ঞতার পর সে শুধু বলে, 'তোমাকে তিক্ত না হতে শিখতে হবে।'

টর্চার অত্যন্ত নিন্দনীয় হলেও তার পেছনে যুক্তি রয়েছে। বিশেষ করে আধুনিক অত্যাচারের পেছনে। অন্যের দৈহিক যন্ত্রণার সঙ্গে আপনার কোন যোগ নেই। ঠিক যেমন অন্যে যখন আপনাকে বলে, সে দাঁতের ব্যথায় খুব কষ্ট পাচ্ছে। বড় জোর আপনি তার জন্য দুঃখবোধ করতে পারেন, কিন্তু তার যন্ত্রণার কিছুই আপনি কল্পনাও করতে পারেন না। অত্যাচারের ক্ষেত্রে অবস্থাটা আরো শোচনীয়। যাকে অত্যাচার করা হচ্ছে সে যখন কষ্ট পাচ্ছে তখন অত্যাচারী খুশি কেননা সে নিজে স্বাধীন। আমার ধারণা, সংবেদনশীলতা ও কল্পনাশক্তি না থাকলে আপনি সহজেই অত্যাচার করতে পারবেন এবং এটা অতি আধুনিক এক প্রবণতা।

যে-যুগে কোন ছবি তৈরি হচ্ছে সেই যুগের সঠিক চিত্র তুলে ধরতে না পারলে ছবিটিকে সমাধুনিক বলা যাবে না। ফরাসী প্রতিরোধ নিয়ে তখন ছবি করা হলে আমি তাকে অশালীন বলেই মনে করব, কেননা এখন তা হবে সাজানো, ভেজাল ও অসৎ। এখনকার সত্যকে স্পষ্ট করে তুলে ধরাই লক্ষ্য হওয়া উচিত। 'A Bout de Souffle'-য়ে সংলাপ যা-ইচ্ছে-তাই করা গেছিল, সবকিছুই সেখানে ছিল প্রযোজ্য, মানানসই। কিন্তু এখানে নির্দিষ্ট কাহিনি সূত্র ছিল, চরিত্রগুলোকে দিয়ে নির্দিষ্ট মুহূর্তে নির্দিষ্ট কথাই বলানোর ছিল। অন্যকিছু হলে চলত না। এই ছবিটা করার সময় আমি প্রকৃতই ব্রেসঁ ('পিকপকেট') ও মালরো-র প্রভাবাধীন ছিলাম।

'Une Femme est une Femme'-টা আবার অনেকটা লুবিৎশ-এর মত। ভীষণ মজার। এটা কমেডি না ট্রাজেডি তা ঠিক জানি না, তবে যাই হোক না কেন একটা মাস্টারপীস। অবশ্য ছবিটার মধ্যে একটা বড় ভুল রয়ে গিয়েছে, এটা রঙে তোলা। তবে শেষ পর্যন্ত ছবিটার ব্যাপারে আমি খুশি কেননা এটা পাঁচ সপ্তাহে টানা শ্যুটিং করেছি, যেমন দু'বছর আগে এর চিত্রনাট্যটা টানা লিখেছিলাম, আধ ঘণ্টায়। ছবিটা সম্পর্কে দুটো মন্তব্য করা যায়, হয় 'এটা একটা সঙ্গীতবিহীন মিউজিক্যাল কমেডি' অথবা 'ছবিটা চিত্তাকর্ষক ভুলের একটা উদাহরণ'। আমি যে-সমস্ত ছবি তৈরি করব তাতে কেন কোন ভুল থাকবে না বা তা কিছু মানুষকে বিক্ষুব্ধ করবে না আমি তার

কোন কারণ খুঁজে পাই না। সাহিত্য, চিত্রকলা বা সঙ্গীত সম্পর্কে এরকম দাবি কেউ করে না।

জীবন এবং চিত্রপরিচালনায় আমি কোন পার্থক্য দেখি না। চিত্রপরিচালনায় জীবনেরই প্রতিফলন পড়ে। এই জন্য, আমার ছবিতে, চরিত্রদের যে-কোন বিষয়ে কথা বলতে দিই। আমি তাদের 'জীবন্ত' অবস্থায় ধরতে চাই। সেই কারণেই ডকুমেণ্টারির সঙ্গে আমি কিছুটা ফিকশনের মিশ্রণ ঘটাই। সিনেমায় সবচেয়ে সুন্দর জিনিসটি ঘটে তখনই যখন ডকুমেণ্টারির মধ্যে ফিকশন প্রবেশ করে। তাই 'নানুক অব দি নর্থ' হল সবচেয়ে সুন্দর ফিল্ম। এই ডকুমেণ্টারিতে ফিকশন প্রবেশ করেছে।

'Le Mepris'-য়েও কল্পনা সম্পূর্ণ উপচে পড়ে জীবনের পাত্রে প্রবেশ করে। ছবির এক জায়গায়, অনেকটা যেন কাকতালীয় ভাবেই মিচেল পিক্কোলি বলে, 'জীবনে আমরা মেয়েদের দেখি পোষাক পরা অবস্থায় আর পর্দায় তাদের দেখা যায় বিবস্ত্র...।' ছবির শুরুতে ব্রিজিত বার্দোকে বিশেষ এক রঙীন দৃশ্যে নগ্নাবস্থায় দেখা যায়। জুল ভার্নের লেখায় যেমন পাওয়া যায় বিজ্ঞানী, শিশু এবং ক্যাপটেনকে, এই ছবিতে তেমনি রয়েছে যুবতী স্ত্রী (বার্দো), অ্যাডভেঞ্চারার (পিক্কোলি) এবং এক বৃদ্ধ মানুষ (ফ্রিজ ল্যাঙ)। এর গল্প হল একটি পুরুষ ও একটি নারীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির গল্প। যে ভুল বোঝাবুঝি হল আধুনিক জীবনের এক লক্ষণ। এই ছবি জটিল বিষয় নিয়ে তোলা এক সরল ফিল্ম এবং তা ডকুমেণ্টের চাইতে জীবনের প্রতিফলনই বেশি। এক্ষেত্রে—এবং এটা আমার কাছে নতুন—প্রধান চরিত্র বলে কেউ ছিল না, তার বদলে ছিল কয়েক দল মানুষ, আধুনিক জগতের যে অধিবাসীরা যেন জাহাজডুবির পর কোন রহস্যময় দ্বীপে এসে উঠেছে, যেখানে রয়েছে নীল জল ও অফুরন্ত রোদ আর যেখানে সভ্যতার সমস্ত কিছুকেই আবার নতুন করে গড়ে তুলতে হবে, এমনকি সিনেমাকে পর্যন্ত।

এই ছবির চরিত্রগুলি যদি অতিরিক্ত 'ভদ্রসভ্য' হয়ে থাকে তবে সেই তুলনায় 'Bande a Part'-য়ের চরিত্রগুলি কোন পূর্বনির্ধারিত ধারণা বা পদ্ধতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, তারা অনেক 'জান্তব', বেঁচে আছে প্রবৃত্তিচালিত হয়ে, তাৎক্ষণিকভাবে। সকলেই বুঝতে পারবে এমন একটা সহজ ছবি করার উদ্দেশ্য থেকে এই ছবিটা করা। ছবিটা শুরু হয়েছিল একে একটা বিশুদ্ধ রিপোর্টাজের রূপ দেবার বাসনা নিয়ে। কিন্তু মানুষকে যতই পর্যবেক্ষণ করা হয় ততই তাদের সম্পর্কে আগ্রহ বাড়ে, আপনাকে তাদের আরো কাছে যেতে হয়, আরো ঘনিষ্ঠ হতে হয়। এবং একই সঙ্গে এই ধারণাও অক্ষুণ্ণ রাখতে হয় যে আপনি যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রাখছেন। অনেকটা এই দ্বৈত প্রবণতা থেকেই বোধহয় আমার সবকিছু একই সঙ্গে বলে ফেলার প্রবৃত্তি।

এই ছবিটির চরিত্রগুলো হল ছোট জন্তুর মত। এরা 'Les Carabiniers'-য়ের

বন্য প্রাণী নয়, তার বদলে গৃহপালিত জন্তু। এরা অন্য লোকদের মত নয়, এরা 'সমাজচ্যুত দল'। তারা নিজেদের মত করে জীবন যাপন করে। এটা ঠিক নয় যে, এরা সমাজের বাইরের জীব। বরং সমাজই এদের থেকে কয়েক হস্ত দূরে। ছবির সমাপ্তিতে তারা একটা উপসংহারে এসে উপস্থিত হয়, নিজেরা নিজেদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। ছবির শেষ শট যেন বার্গম্যানের কোন ছবির মরাল : সমস্ত অঘটনের পর জীবন আবার নিজের খাতে বইতে থাকল।

'Alphaville'-য়ের জগৎ হল সেই জগৎ যেখানে আলোক রাত্রির অন্ধকার ফুটো করে বেরিয়ে আসে ঠিক যেমন নীরবতা বা কোলাহলকে চাপা দিয়ে উঠে আসে কবিতা। এই ছবি কি সায়েন্স ফিক্‌শন জানি না। 'Pierrot le Fou' কি স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমের কাহিনি, ঠিক জানি না। শুধু জানতাম যে, ছবিটা অবশ্যই যাবে সমুদ্রের ধারে। ছবির আরম্ভটা শট নেবার আগে ভেবে চিন্তে ঠিক করে রাখা হয়েছিল, ছবির শেষটা লোকেশনে শট নেবার মুহূর্তে উদ্ভাবিত হয়। প্রেমের প্রতি আমার মোহ ও সুদূরতার যে দ্বৈত অনুভূতি তা অভিনেতাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। একজন লোক কী করে অভিনেতা হতে পারে? এটা আমি কখনো বুঝতে পারি না। অভিনেতাদের একইসঙ্গে ভীষণ ও সরল বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। আর তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক প্রায়শই তিক্ত। তাদের সঙ্গে কথা আমি বলি না, সেটা আরো কঠিন হয়ে দাঁড়ায় এই জন্য যে সব সময়েই, রুগ্ন শিশুর মত তাদের অভয় দেবার প্রয়োজন হয়। আত্মপ্রকাশে অক্ষম বলেই অবশ্য তারা অভিনেতা হয়েছে। যেন জন্ম মুহূর্তেই নবজাতকের কথা বলার চেষ্টা এবং তা সম্ভব নয় বলেই যেন অপরের কাছ থেকে অভিব্যক্তি ধার করা।

এই দৌর্বল্যের জন্যই অভিনেতাদের অবস্থা আমাকে গভীরভাবে ভাবায়। অভিনেতা একজন ডন জুয়ান, যুগপৎ একাধিক অস্তিত্বের অধিকারী, কামুর এবম্বিধ ধারণার সঙ্গে আমি একমত নই। অভিনেতাদের কোন 'অস্তিত্ব নেই', আর তা তারা জানেও। অনেক চরিত্রে জন্ম নেওয়া দূরের কথা, নিজেদের অসম্পূর্ণতা বিষয়ে তাদের সর্বদাই সচেতন করে দেওয়া হয়। 'আছি' আর 'রাখো'র মধ্যে যে দূরত্ব, স্রষ্টা আর অভিনেতার মধ্যেও সেই দূরত্ব। অভিনেতা কখনো 'আছি' বলে না। এতদ্‌সত্ত্বেও ভালো পেশাদার অভিনেতা বলে কিছু নেই, ব্রেসঁ-র এই অভিমত স্বীকার্য নয় আমার কাছে। ব্রেসঁকে আমি ভয়ানক শ্রদ্ধা করি, তিনি নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ পরিচালকদের অন্যতম, কিন্তু একথা না বলে উপায় নেই যে, অভিনেতা সম্পর্কে তাঁর মনোভাব অনেকটা বর্ণবিদ্বেষীর মত। 'পিয়েরো লো ফু'—এই ছবির পর থেকে আমার ছবি একটা বড় বাঁক নেয়। ছবিতে প্রত্যক্ষ রাজনীতি প্রধান নিয়ামক হয়ে ওঠে। 'La Chinoise'-য়ে দরজায় দরজায় থিয়েটারের পালা শুরু করে অভিনেতা গুইয়োম বিপ্লবের মূল সত্যকে প্রয়োগ করে। সে সবচেয়ে অগ্রগামী

একজন। মাওয়ের চিন্তারাজি অধ্যয়নের ভিতর দিয়ে সে তার বৃত্তিকে খুঁজে পেয়েছে। অর্থাৎ বলতে গেলে রাজনীতিই তাকে শিল্প আবিষ্কারের জন্য তৈরি করেছে।

এর ঠিক আগে একসঙ্গে দুটো ছবি করেছি। মারিনা ভ্লাদি অভিনীত 'Deux ou Trois' এবং আনা কারিনা অভিনীত 'Made in U.S.A.' আধুনিক জীবন বলতে যা বোঝায় তাকে বিশ্লেষণ করা কিংবা অস্তিত্বের গভীরতম প্রদেশে কী ঘটছে জীববিজ্ঞানীর মত তা ডিসেক্ট করার সুযোগ ছাড়া ছবি দুটির মধ্যে বোধহয় আর কোন সাদৃশ্য নেই। স্টাইলেও পৃথক, পরস্পর সম্পর্কহীন। সমুন্নত গৃহপ্রকল্পগুলিতে পার্ট-টাইম গণিকাবৃত্তি সম্পর্কীয় এক তদন্তের উত্তরে এক পত্রিকায় এক ভদ্রমহিলার চিঠিই হচ্ছে প্রথম ছবিটির উৎস। আর দ্বিতীয় ছবিটির প্রধান উদ্দেশ্য ফরাসী জীবনে মার্কিনায়নের সমীক্ষা। এই সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষার মূল কথা হচ্ছে এই যে বর্তমানে সবকিছুই মার্কিন-প্রভাবিত।

প্রথম ছবিটির তাৎক্ষণিক প্রেরণা সংবাদপত্রের একটা তুচ্ছ ঘটনা হলেও আমার প্রিয় মতবাদের একটির সঙ্গে এর সাদৃশ্যই আমাকে উত্তেজিত করে। বর্তমান প্যারীর সমাজে বাস করতে গেলে কোন না কোন ভাবে গণিকাবৃত্তি অপ্রতিরোধ্য, বা, ঘুরিয়ে বললে, গণিকাবৃত্তি সদৃশ পারিপার্শ্বিকের মধ্যেই বাঁচতে হবে। শ্রমিককে তার সময়ের এক চতুর্থাংশ এক রকম আত্মসমর্পণ করেই থাকতে হয়—এমন একটা কাজ তাকে করতে হয় যা তার একেবারেই ভালো লাগে না। প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই এ-কথা প্রযোজ্য। শিল্প-কেন্দ্রিক সমাজে আত্মসমর্পণই আদর্শ। আমার ছবি ওই সমাজেরই দু-একটি পাঠ উপস্থিত করার চেষ্টা মাত্র। এই ছবিতে বারবধূ মারিনা নয় স্বয়ং প্যারী।

বস্তুত, নাটকীয়তার বাইরে এই সতেজ স্বাভাবিকতা পুনরাবিষ্কারই হচ্ছে চিত্রপরিচালকের কাম্য। আরেকভাবে বলতে গেলে সমস্ত কিছুর পুঙ্খানুপুঙ্খ পুনরাবিষ্কারের প্রয়োজন। সমাধান একটা : মার্কিন সিনেমা ত্যাগ করা। প্রতিটি ছবিই সমাজেরই পরিণাম। এই কারণে মার্কিন ছবি আজকের দিনে নিকৃষ্ট। একটি অসুস্থ সমাজকেই তা প্রতিফলিত করে। আধুনিক সোভিয়েট সিনেমার হলিউড অনুকরণ—তাও এমন সময়ে যখন হলিউডের আর কিছুই দেবার নেই—আমার অসহ্য লাগে। ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারেন, এই হল আমার রুশ-মার্কিন সমঝোতার বিরোধিতা করার পদ্ধতি। এতদিন, আমরা একটা বদ্ধ পৃথিবীতে বাস করছিলাম। সিনেমা ছিল আত্মভূক ও স্বানুকারী। এখন আমি বুঝতে পারি প্রথম ছবিগুলোতে আমিও পূর্বদৃষ্ট ছবিরই অনুকরণ করেছি। এখন চলছে অনুকরণ, সংগঠন ও বাঁধ ভাঙার যুগ।

বলা যায় ১৯৬৮-র মে-জুন থেকে আমার এই নতুন পর্বের সূচনা। বুর্জোয়া চিত্রনির্মাণ থেকে বিপ্লবী চিত্রনির্মাণের জগতে পদার্পণ। একটা গোষ্ঠী (জিগা-ভের্তভ গোষ্ঠী) গঠন করে দলবদ্ধ হয়ে কাজ করা। ফ্রান্সে যার অর্থ লড়াই করা, সংগ্রাম করা।

অর্থাৎ ছবির মধ্য দিয়ে সংগ্রাম করা। কাজটা রাজনৈতিকভাবে আপাতত খুবই কঠিন। অর্থনৈতিক ভাবেও। আপনাকে শাসক শ্রেণীর অর্থনীতি থেকে মুক্ত হতে হবে। বুর্জোয়া ভাবধারা থেকে প্রথমে মুক্ত হয়ে তারপরই বিপ্লবী ভাবধারার দিকে অগ্রসর হওয়া সম্ভব। তার মানে আমাদের গোষ্ঠী হিসেবে, সংগঠন হিসেবে কাজ করার চেষ্টা করতে হবে, ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য সংগঠিত হতে হবে। ছবি হচ্ছে এই ঐক্য গড়ে তোলার কাজের অংশবিশেষ।

আমি প্রথমে ছিলাম বুর্জোয়া চিত্রপরিচালক, তারপর প্রগতিশীল চিত্রপরিচালক, তারপর আর চিত্রপরিচালকই না, বিপ্লবী চিত্রকর্মের কর্মীবিশেষ, যখন আমাকে কর্তব্য-কর্ম হিসেবে রাজনৈতিক কর্ম শিখতে হয়েছে। আগে আমাদের ছবিতে মূলত নেগেটিভ দিকই বেশি থাকত, কিন্তু তাদের অংশ বিশেষকে পরবর্তী ছবিতে পজিটিভ লক্ষণে রূপান্তরিত করা যেত কারণ মোটের ওপর আমাদের অনুসৃত পদ্ধতি ছিল প্রগতিশীল। এই প্রগতি ছিল মাত্রিক বিচারে। কিন্তু একটা সময়ে আপনাকে মাত্রিকতা থেকে ঘাতের পরিবর্তনে যেতেই হয়। আমার পক্ষে এটা একটা বিরাট অগ্রগতি।

এখন আমি মনে করি বাস্তব হচ্ছে বাস্তব, ফিকশন হচ্ছে ফিকশন এবং সমস্ত ছবিই ফিকশন। ডকুমেণ্টারিও বাস্তবতা নয়। একমাত্র সমস্যা হচ্ছে বিপ্লবী ফিকশন তৈরির চেষ্টা করা। বুর্জোয়া কাহিনি চিত্র নির্মাণ থেকে বিপ্লবী কাহিনি চিত্র নির্মাণে আসা মানে বহু অজানা অঞ্চলের মধ্য দিয়ে লং মার্চ করা। এতদিন অনুভূতিকে প্রধান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, তারপর ধারণা বা প্রতীতিকে। এখন উল্টোটা করতে হবে, আপাতত অনুভূতিকে আমরা গুরুত্ব দেব না। এই আপাতত সময়টা একশো বছরও হতে পারে, যখন প্রতীতির পরে অনুভূতির স্থান।

ছবির প্রধান উপাদান হল ইমেজ ও সাউণ্ড। এদের মধ্যে এক দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক বর্তমান। বুর্জোয়া পরিচালক কিন্তু পর্দায় এই দুই উপাদানকে স্রেফ যুক্ত করেন, ঠিক যেভাবে চিঠির ওপর ডাকটিকিট সাঁটা হয়, তার বেশি কিছু না। আমরা ওই একই উপাদান ব্যবহার করি, কিন্তু এমনভাবে ব্যবহার করি যে তারা ব্যবহৃত হবার সঙ্গে সঙ্গে রূপান্তরিতও হয় এবং মধ্যকার দ্বন্দ্ব ও সংঘাতটা বেরিয়ে আসে। এটা একটা রাজনৈতিক প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় হয়ত এশিয়ায় দু-একজন কাজ করছেন, আফ্রিকায় দু-তিন জন, আর কাজ করছেন চীনদেশে। চীনের নিজস্ব অবস্থা ও পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে। এটা সেদেশে সম্ভব কেননা দীর্ঘকাল সেখানে জনতার শাসন চলছে।

গ্রন্থনা : সুস্মিতা ভট্টাচার্য

অনুবাদ : পবিত্র বল্লভ